আলোচনা সহায়ক তথ্য:

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের নিয়মাবলি

- স্যান্ডেল পায়ে পায়খানায় যেতে হবে যাতে পাদানির সাথে পায়ের স্পর্শ না লাগে
- দুই পাদানির উপর পা রেখে বসতে হবে
- মল ত্যাগের পূর্বে প্যানে বা কমোডে সামান্য পানি ঢেলে দিতে হবে যাতে প্যানে মল লেগে যেতে না পারে
- পায়খানা করার পর টয়লেট পেপার অথবা প্রচুর পানি ব্যবহার করতে হবে
- পায়খানা ব্যবহারের পর প্রথমে বাম হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরে সাবান দিয়ে দুই হাত ভালোভালো ধুতে হবে
- সব সময় পানির পাত্র (বদনা), পানির ট্যাপ, মগ, বালতি ডান হাতে ধরতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মাবলি

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের পর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করলে তা যতই ভালো পায়খানা ঘর হোক না কেন, স্বাস্থ্যসম্মত থাকবে না। পায়খানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়খানা রোগ-জীবাণু কম ছড়ায় এবং তা ব্যবহার করতেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মাবলি

- পায়খানা পানি দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়
- নিয়মিত ঝাড়ু, জীবানুনাশক দ্রবণ ও পর্যাপ্ত পানি দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে
- পরিষ্কার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন জলাবদ্ধ অংশের কোন ক্ষতি না হয়
- পায়খানা ব্যবহারের পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে যেন মলমূত্র পাদানির গায়ে এবং জলাবদ্ধ গর্তের ঢাকনার উপর না থাকে
- গর্ত-পায়খানা ভরে গেলে, আগের পায়খানা থেকে অন্তত ৪ হাত দূরে নতুন গর্ত করে পায়খানা তৈরি করতে হবে, আর যদি সেপটিক ট্যাংক থাকে এবং ভরে যায় তাহলে তা সময়মতো পরিষ্কার করতে হবে
- স্কুলে ছেলেদের পায়খানা ছেলেরা এবং মেয়েদের পায়খানা মেয়েরা পরিষ্কার রাখবে। এজন্য পর্যায়ক্রমে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে
- স্কুল বন্ধ থাকলে পায়খানার দরজা তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

পায়খানার পর হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা

- মলদ্বারে মলের দুর্গন্ধ থাকে এবং মলের সাথে অসুস্থ মানুষের দেহ থেকে ডায়রিয়া, আমাশয়ের রোগ-জীবাণু, কৃমি/কৃমির ডিম বের হয়
- হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে না ধুলে হাতে ও নখের ভেতরে রোগের জীবাণু এবং কৃমির ডিম থেকে যায়
- খাওয়ার সময় নোংরা হাত থেকে পেটে এসকল রোগের জীবাণু ঢুকে পড়ে

মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করলে:

- হাতে দুর্গন্ধ থাকবে না
- হাত জীবাণু মুক্ত হবে।

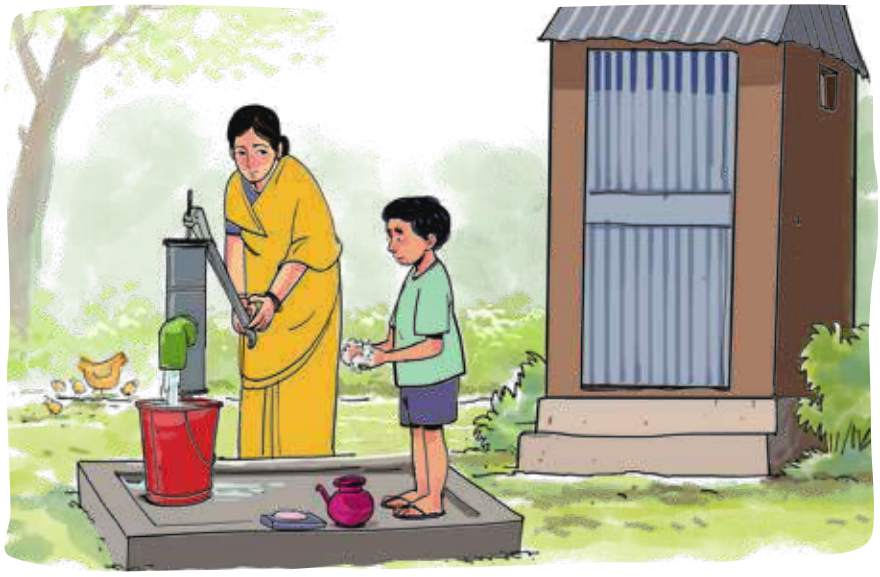

ধাপ - ৫: সারসংক্ষেপ

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন আমাদের জীবনের অতি আবশ্যকীয় অংশ। নিরাপদ পানি যেমন জীবন বাঁচায়, অনিরাপদ বা দূষিত পানি বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ বা অসুস্থতার কারণ ঘটায়। একই সাথে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারও আমাদের সুস্থতা বজায় রাখার জন্য অতীব প্রয়োজন। আমাদের ব্যক্তি, পারিবারিক ও স্কুল - সকল ক্ষেত্রেই নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) নিরাপদ পানি কি ও কোন কোন কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার করতে হবে?
২) কীভাবে আমরা নিরাপদ পানি পেতে পারি? পানি কীভাবে দুষিত হয়?
৩) স্যানিটেশন বলতে কি বোঝায়? স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বলতে কি বোঝায়?
৪) কীভাবে আমরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ করব?
৫) পায়খানার পর কেন হাত ধুতে হবে?

প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় - ৫: কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে মৌলিক ধারণা পাবে এবং এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	প্রজনন স্বাস্থ্য	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা	২৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৪.	প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও তার গুরুত্ব	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: প্রজনন স্বাস্থ্য

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? তাদের উত্তর শুনে নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপনার সাহায্যে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বয়ঃসন্ধিকালেই কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে এবং এ সময়েই ছেলে-মেয়েদের নিজেদের দেহ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী হয়। নিজেদের দেহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভালো এবং এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এ সময় প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কি সে বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এতে করে তারা নিজেদের প্রজনন স্বাস্থ্যের যত্নের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে। সাধারণ ধারণায় অনেকেই মনে করে প্রজনন স্বাস্থ্য কেবলমাত্র নারীদের জন্য এবং শুধুমাত্র গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সময়েই নারীদের বিশেষ যত্ন নেয়া দরকার আর সেটাই হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা। আবার অনেকেই ভাবে কোন পুরুষ বা নারী যখন যৌনরোগে আক্রান্ত হন তখন যৌনরোগ প্রতিরোধের জন্যে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই প্রজনন সেবা। কিন্তু একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত।

প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্য

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? তাদের উত্তর শুনে নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপনার সাহায্যে আলোচনা করুন।

প্রজনন: যে প্রক্রিয়ায় জীব তার অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে, তাকে প্রজনন বলে।

প্রজননতন্ত্র: গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অঙ্গ কাজ করে এগুলোকে একসাথে প্রজননতন্ত্র বলে। নারী ও পুরুষভেদে প্রজননতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয় - মেয়েদের প্রজননতন্ত্র এবং ছেলেদের প্রজননতন্ত্র।

প্রজনন স্বাস্থ্য:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে, "শুধুমাত্র প্রজননতন্ত্রের কার্য এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায় না, এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থা।"

অতএব, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য কেবলমাত্র তাদের প্রজনন সম্পর্কিত শারীরিক গঠন প্রণালী, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রক্রিয়ায় কোন রোগের অভাব বা অক্ষমতাকে বোঝায় না। কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের একটি অবস্থাকে বোঝায়।

ধাপ - ২: প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কি এবং কোন বয়স থেকে এই সেবা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা শুরু হয়? ছেলে এবং মেয়েদের প্রজনন অঙ্গগুলো কী কী? তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন। এভাবে প্রশ্নোত্তর শেষে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সহকারে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কী?

কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা হচ্ছে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর প্রতিরোধ ও সমাধান করার জন্য কিছু পদ্ধতি, কৌশল ও সেবাসমূহের সমাহার যা প্রজনন স্বাস্থ্যের কল্যাণের জন্য সহায়ক।

অল্প বয়স থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা শুরু হয়। ফলে:

- অল্প বয়সেই সন্তানের বিশেষ যত্ন নিতে হবে
- এই সেবা বয়ঃসন্ধিকালে আরো বাড়াতে হয়, এবং
- প্রজননক্ষম সময় ও পরবর্তী সময়ে এই সেবার গুরুত্ব অপরিসীম।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্র

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের অনেকগুলি অংশ রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি বাইরে থেকে দেখা যায় এবং কয়েকটি অংশ দেহের ভিতরে থাকে, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

ছেলেদের দেহের নিচের দিকে একটি ঝুলন্ত থলি আছে, যাকে অন্ডকোষের থলি বলে। এ থলির ভিতরে দুটো গোলাকার অন্ডকোষ বা টেস্টিস ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একটি ছেলে যখন বড় হয় তখন এ অন্ডকোষ থেকেই শুক্রাণু তৈরি হয়। এই শুক্রাণু যৌনমিলনের মাধ্যমে মেয়েদের ডিমের সাথে মিলিত হয়ে সন্তান সৃষ্টি হয়। শুক্রাণু তৈরির এ প্রক্রিয়া সারাজীবন চলতে থাকে।

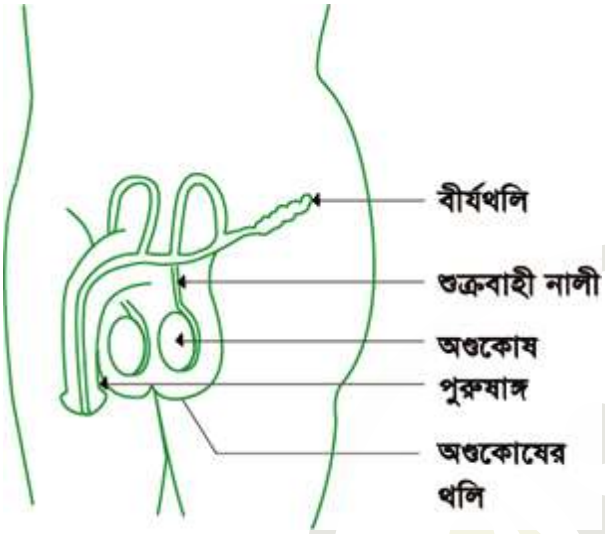

অন্ডকোষে শুক্রাণু তৈরি হবার পর শুক্রবাহী নালী দিয়ে বের হয়ে এ শুক্রাণু বীর্যের সাথে মিলিত হয়। ছেলেদের তলপেটে দুটি বীর্যথলি আছে যা থেকে এক রকম পিচ্ছিল রস তৈরি হয়। এ রসকেই বীর্য বা সিমেন (semen) বলে। ছেলেরা বড় হবার পরে যৌন উত্তেজনা হলে পুরুষাঙ্গ থেকে এ বীর্য বের হয়।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের একটি বিশেষ অংশ হলো পুরুষ লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ যা বাইরে থেকে দেখা যায়। এর আকার বা আকৃতি সবার এক রকম হয় না। বীর্য এবং প্রস্রাব একই পথে অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ দিয়ে বের হয়, তবে তারা এক সঙ্গে বের হয় না।

মেয়েদের প্রজননতন্ত্র

প্রজননতন্ত্র হচ্ছে সেই সমস্ত অঙ্গের সমষ্টি যেগুলো সন্তান উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মেয়েদের প্রজননতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয়:

১. অন্তঃপ্রজনন অঙ্গ - যা বাইরে থেকে দেখা যায় না
২. বহিঃপ্রজনন অঙ্গ - যা বাইরে থেকে দেখা যায়।

অন্তঃপ্রজনন অঙ্গ

ওভারি বা ডিম্বাশয়: মেয়েদের তলপেটের দুইপাশে দুটো ডিমের থলি আছে। এই থলি দু'টিকে ওভারি বা ডিম্বাশয় বলে। ডিম্বাশয়ে অপরিপক্ক ডিম্বাণু জমা থাকে, প্রতিটি মেয়ে যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায় তখন প্রত্যেক মাসে এই ডিমের থলিতে একটি করে ডিম বড় হয়। এখানে মেয়েদের শরীরের হরমোনও তৈরী হয়।

জরায়ু: দুই ওভারি/ডিম্বাশয়ের মাঝখানে, তলপেটে একটি জরায়ু (বাচ্চাদানী) বা থলি আছে। এটি ত্রিকোণাকৃতির হয়। জরায়ুর নিচে সিলিন্ডার আকারের ছোট একটি অংশকে জরায়ুর মুখ বা সারভিক্স বলা হয়। এ জরায়ুতেই মাসিকের রক্ত তৈরি হয় এবং এখানেই শিশু বড় হয়।

ডিম্ববাহী নালী: জরায়ুর ওপরের দিকে দুই পাশ থেকে দু'টো নালী শুরু হয়ে ওভারী বা ডিম্বাশয়ের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ নালী দু'টিকে ডিম্ববাহী নালী বা ফেলোপিয়ন টিউব বলে। ডিম্বাশয়ের কাছে এই নালীর আঙ্গুলের মত অংশকে ফিমব্রিয়া বলে। প্রতিমাসে ডিম্বাশয়ে যখন একটি করে ডিম পরিপক্ক হয় তখন তা এই নালী দিয়ে জরায়ুতে আসে। এখানেই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ হয়।

যোনিপথ: জরায়ুর নিচে মেয়েদের বাচ্চা হবার রাস্তা বা যোনিপথ আছে। এ যোনিপথ জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকে এবং নিচের দিকে ছোট একটি ছিদ্র হয়ে বাইরে এসে শেষ হয়। এই যোনিপথের অনেকগুলো কাজ রয়েছে, যেমন- এ পথে মাসিকের রক্ত বের হয়, যৌনমিলন হয় এবং সন্তান প্রসব করে। এপথের ঝিল্লি ভাঁজ ভাঁজ থাকে। এখানে যে রস নিঃসৃত হয় তার প্রকৃতি অম্লীয় এবং যোনী রসের এই অম্লীয় প্রকৃতি যোনিপথের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু মাসিকের সময় এবং প্রসবের সময় এই পরিবেশ পরিবর্তন হয়, নিঃসরণের প্রকৃতি বদলে ক্ষারীয় হয়ে যায় এজন্য এসময় সংক্রমণের আশংকা বেশী থাকে। তাই এই সময় ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

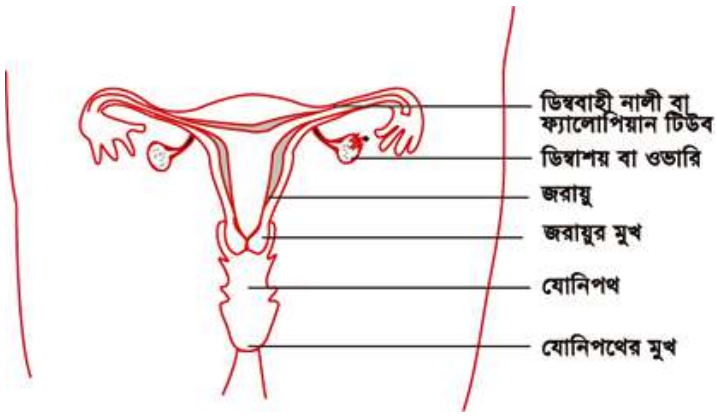

মেয়েদের দেহের নিচের দিকে যোনিপথের মুখ ছাড়াও আরো দু'টি ছিদ্রপথ আছে। যোনিপথের সামনের ছিদ্রটি মুত্রনালীর মুখ এবং পিছনের ছিদ্রটি পায়ুপথের মুখ।

ধাপ - ৩: প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান

উপস্থাপক প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তাদের উত্তর শুনে নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা দিন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান

কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদনসমূহের বিষয়ে সচেতনতা অতীব জরুরী। প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদনসমূহ হচ্ছে-

- কিশোর-কিশোরীর বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা
- নিরাপদ মাতৃত্ব
- পরিবার পরিকল্পনা
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ
- যৌনবাহিত রোগ, ইত্যাদি বিষয়ে সেবা।

ধাপ - ৪: প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও তার গুরুত্ব

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাদের ধারণা জেনে নেবেন এবং তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। এরপর আলোচনা ও স্লাইড প্রদর্শন করে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব

অসচেতনতার ফলে অনেক সময় প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয় না। কখনো আবার লজ্জাকর ব্যাপার মনে করে প্রায় সবটাই গোপন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ করে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়ঃ

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
- নিরাপদ যৌন আচরণ সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনরোগ সম্পর্কে জানা ও প্রতিরোধ করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজননস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করা
- অল্প বয়সে বিয়ে করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা
- যথাযথ মাসিক ব্যবস্থাপনা
- নিয়মিত গোসল করা।

- পুষ্টিকর খাবার ও প্রচুর পানি পান করা
- প্রজনন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া
- ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা
- পড়াশোনা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা
- অশ্লীল বইপত্র এবং ভিডিও বা সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকা
- বাল্যবিবাহ পরিহার করা
- বাল্যবিবাহ হয়ে গেলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা
- যৌন নির্যাতনের শিকার হলে অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা-বাবা বা বিশ্বস্ত কোনো মানুষকে বিষয়টি জানানো।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে মৌলিক ধারণা ও উপযুক্ত শিক্ষা তাদের ইতিবাচক এবং দায়িত্বশীল আচরণে সক্ষম করে তুলবে।

ধাপ - ৫: সারসংক্ষেপ

বয়ঃসন্ধিকাল ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা সামগ্রিকভাবে দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতেই প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের, তাদেরকে বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। কিশোর-কিশোরীরা সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারলে তারা ভবিষ্যতে সুস্থ ও উৎপাদনমূখী জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের কেন জানতে হবে?

২) প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো কি?

৩) প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়গুলো আলোচনা কর?

অধ্যায় - ৬: প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত রোগ ও করণীয়

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত রোগ, এইচআইভি ও এইডস কী এবং এ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য জটিলতা; কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায় বা ছড়ায় না এবং কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে নিজে জানতে পারবে ও সচেতন হবে এবং সহপাঠীদের সচেতন হতে সাহায্য করবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণ কি? প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের/রোগের কারণ কি?	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট ইজেলবোর্ড ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
২.	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের লক্ষণসমূহ এবং জনস্বাস্থ্য সমস্যা	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৩.	কিশোর-কিশোরীদের যৌনবাহিত সংক্রমণ, সংক্রমণের উপাদান ও প্রতিকার	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৪.	এইচআইভি এবং এইডস কি, কীভাবে ছড়ায় এবং কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	১০ মিনিট		

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণ কি, সংক্রণের কারণ

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জানতে চাইবেন প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণ সম্পর্কে তারা কী জানে এবং কেন এই সংক্রমণ হয় সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা আছে কি না। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন ও সহায়ক তথ্যের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ: প্রজনন অঙ্গসমূহে সংক্রমণকে 'প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ' বলে। এর মধ্যে রয়েছে যৌনবাহিত রোগ এবং প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য সংক্রমণ। যৌন সম্পর্ক (যৌনবাহিত সংক্রমণ) ছাড়াও সংক্রমিত প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ: প্রজনন অঙ্গসমূহে সংক্রমণকে 'প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ' বলে। এর মধ্যে রয়েছে যৌনবাহিত রোগ এবং প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য সংক্রমণ। যৌন সম্পর্ক (যৌনবাহিত সংক্রমণ) ছাড়াও সংক্রমিত রক্ত/রক্তজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ, সংক্রমিত সূঁচ/যন্ত্রপাতি ও আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে। সকল যৌনবাহিত সংক্রমণই প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের আওতায় পড়ে।

যৌনবাহিত সংক্রমণ: যৌন সম্পর্ক/শারীরিক মেলামেশার মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে যেসব সংক্রমণ ছড়ায় তা 'যৌনবাহিত সংক্রমণ'। তবে কিছু কিছু যৌনবাহিত সংক্রমণ জীবাণুযুক্ত রক্ত ব্যবহারের ফলে কিংবা রোগাক্রান্ত মা থেকে তার গর্ভের শিশুর মধ্যেও ছড়াতে পারে।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের/রোগের কারণ:

সংক্রমণের/রোগের কারণ:

- ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা
- প্রজননতন্ত্রের জীবাণুগুলোর অতিবৃদ্ধি
- অনিরাপদ যৌনমিলন
- জীবাণুযুক্ত পরিবেশ
- সংক্রমিত রক্তগ্রহণ
- সংক্রমিত মায়ের গর্ভধারণ।

১. **ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা:** ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে, যেমন: মাসিকের প্যাড বা কাপড় অপরিষ্কার বা জীবাণুযুক্ত হলে বা সহবাসের পর যৌনাঙ্গ পরিষ্কার না করলে, মেয়েরা মলত্যাগের পর নিচ থেকে উপরের দিকে পরিষ্কার না করলে (কারণ, এতে জীবাণু যোনিমুখে চলে আসে), অপরিষ্কার অন্তর্বাস পরলে এসব সংক্রমণ হতে পারে।

২. **প্রজননতন্ত্রের জীবাণুগুলোর অতিবৃদ্ধি:** প্রজননতন্ত্রে (স্ত্রী) স্বাভাবিকভাবেই কিছু জীবাণু থাকে, এই জীবাণুগুলোর অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে। এগুলো প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ যা যৌনবাহিত নয়, যেমন: ক্যানডিডিয়াসিস/মোনিলিয়াসিস, ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস ইত্যাদি ।

৩. **অনিরাপদ যৌনমিলন:** বিশ্বস্ত সঙ্গী ছাড়া বা একাধিক সঙ্গীর সাথে কনডম ছাড়া যৌনমিলন করাকে অনিরাপদ যৌনমিলন বলে এবং এতে যৌন সংক্রমণ হতে পারে। যেমন: এইডস, গণোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি।

৪. **জীবাণুযুক্ত পরিবেশ:** তলপেটের সংক্রমণ যা প্রসবকালে/গর্ভপাতের সময় বা অন্য কারণে হতে পারে। গর্ভপাতের জন্য অনেকেই গাছের শিকড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করে থাকে। এগুলো ব্যবহার করলে জীবাণু সংক্রমণসহ মৃত্যুর ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। জীবাণুযুক্ত সিরিঞ্জ, অন্যের ব্যবহার করা ক্ষুর, ব্লেড বা কাঁচি ব্যবহার করলেও এ ধরনের সংক্রমণ হতে পারে। যেমন: এইডস, সিফিলিস ইত্যাদি।

৫. **সংক্রমিত রক্তগ্রহণ:** রক্তগ্রহণের মাধ্যমে, যেমন: সংক্রমিত লোকের রক্ত যদি কোনো পরীক্ষা ছাড়া নেয়া হয়, তাহলে হেপাটাইটিস বি, সি এবং ডি, সিফিলিস, এইডস হতে পারে। এগুলো হলো যৌনবাহিত রোগ।

৬. **সংক্রমিত মায়ের গর্ভধারণ:** মা সংক্রমিত হলে তার থেকে বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায়, বাচ্চার জন্মের সময়/জন্ম হওয়ার পরেও এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে। যেমন: এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া।

ধাপ - ২: প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের লক্ষণসমূহ এবং জনস্বাস্থ্য সমস্যা?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জানতে চাইবেন প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের লক্ষণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা আছে কি না। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন ও সহায়ক তথ্যের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত সংক্রমণের লক্ষণসমূহ:

নারীদের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের লক্ষণসমূহ	পুরুষদের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের লক্ষণসমূহ
• যোনিপথে দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব • যোনিপথে পুঁজ বা ঘন স্রাব • যোনিপথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া • সহবাসের সময় ব্যথা • তলপেটে ব্যথা বা চাকা অনুভব করা • যৌনাঙ্গে ঘা • কুঁচকি ফুলে যাওয়া বা ব্যথা হওয়া • কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর হওয়া।	• প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পুঁজ বের হওয়া • ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া • প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও ব্যথা হওয়া • যৌনাঙ্গে ঘা বা ক্ষত হওয়া • অন্ডকোষে ব্যথা হওয়া ও ফুলে যাওয়া • কুঁচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা হওয়া • কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর হওয়া।

যৌনবাহিত সংক্রমণের লক্ষণসমূহ

- যোনিপথে স্রাব - নারীদের ক্ষেত্রে
- মূত্রনালীর নিঃসরণ - পুরুষদের ক্ষেত্রে
- যৌনাঙ্গে ক্ষত - পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে
- স্ফীত অন্ডকোষ - পুরুষদের ক্ষেত্রে
- তলপেটে ব্যথা - নারীদের ক্ষেত্রে
- কুঁচকিতে ফোলা - পুরুষদের ক্ষেত্রে
- নবজাতকের চোখে সংক্রমণ - শিশুদের ক্ষেত্রে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনরোগের লক্ষণ বোঝা যায় না। বিশেষ করে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এই লক্ষণগুলো অপ্রকাশিত থাকে। তাই চিকিৎসা নিতে তারা অনেক দেরি করে ফেলে, যা থেকে জটিলতাও হতে পারে।

যেসব কারণে যৌনবাহিত সংক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে -

- আক্রান্ত ব্যক্তির উপর যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহের বেশ বড় ধরনের মানসিক, সামাজিক ও চিকিৎসাজনিত প্রভাব পড়ে থাকে। আর আক্রান্ত নারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকি হিসেবে তার গর্ভজাত শিশুতে এই রোগ বা সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা থেকে যায়
- যৌনবাহিত সংক্রমণ সাধারণত যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ায়
- যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহ, যেগুলোতে সাধারণত যৌনাঙ্গে ঘা থাকে, সেগুলো যৌনসঙ্গীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়
- যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহের মধ্যে ক্ল্যামাইডিয়া, গণোরিয়া, সিফিলিস ও ট্রাইকোমোনিয়াসিস- এই ৪টির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

ধাপ - ৩: কিশোর-কিশোরীদের যৌনবাহিত সংক্রমণ, সংক্রমণের উপাদান ও প্রতিকার

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বলবেন তোমাদের মত কিশোর-কিশোরী যৌনবাহিত সংক্রমণের জন্য বেশী ঝুঁকিপূর্ণ; এ বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাইবেন। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন ও সহায়ক তথ্যের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

কিশোর-কিশোরীদের যৌনবাহিত সংক্রমণ:

জৈবিক ও সামাজিক উভয় কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে কিশোরীদের যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, কৈশোরে শরীরের প্রতিরক্ষামূলক ও হরমোনজনিত কার্যসাধনের গঠনপ্রক্রিয়া পুরোপুরি শুরু হয় না। কৈশোরকালে (বিশেষ করে কৈশোরকালের প্রাথমিক পর্যায়ে) মিউকাস ঝিল্লীর অপর্যাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অপরিণত জরায়ুমুখ/সার্ভিক্স খুব সামান্যই এ ধরনের সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বরং যোনিপথের পাতলা আস্তরণ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অসচেতনতা সংক্রমণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহের প্রকোপের উচ্চহার সত্যিকার অর্থেই স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ অনেক স্বাস্থ্য সেবাদানকারীই কিশোর-কিশোরীদের যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু সেবাদানকারীদের এ নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাথে খোলামেলা কথা বলতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণ হওয়ার উপাদানসমূহ কী কী?

আজকের বিশ্বে কিশোর-কিশোরীরা যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার অত্যধিক ঝুঁকির মধ্যে আছে। কৈশোরকালের যৌনসম্পর্ক প্রায়ই পরিকল্পনাহীন ও বিক্ষিপ্ত এবং কখনো কখনো জোরপূর্বক বা চাপের ফলে ঘটে থাকে।

কৈশোরকালে যৌনসম্পর্ক সাধারণত শুরু করে থাকে -

- নিজেদেরকে নিরাপদ করার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের আগেই
- যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য এবং কীভাবে এই সংক্রমণ থেকে বাঁচা যায় তা জানার আগেই
- প্রতিরোধক সেবাসমূহ এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা (যেমন কনডম) নেবার আগেই।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, কিশোর ও অল্পবয়সী যুবকদের মধ্যেই যৌনবাহিত সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি এবং এ ধরনের সংক্রমণকে তারা অহরহই উপেক্ষা করে অথবা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ভুল চিকিৎসা গ্রহণ করে। এছাড়া যৌনবাহিত সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ার সাথে সাথে অরক্ষিত যৌন মিলনের ফলে অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যাও বেড়ে যায়, যেমন: অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এবং অনিরাপদ গর্ভপাত।

ধাপ - ৪: এইচআইভি এবং এইডস কি, কিভাবে ছড়ায় এবং কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জানতে চাইবেন এইচআইভি এবং এইডস বিষয়ে তারা আগে কখনও শুনেছে কিনা, কি শুনেছে বা জেনেছে; তাদের মতামত বোর্ডে লিখবেন ও সহায়ক তথ্যের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

পৃথিবীতে দিন দিন এইচআইভি মহামারি আকার ধারণ করছে। এর প্রকোপ কম বয়সী, তুলনামূলকভাবে দরিদ্র এবং নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে। সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (যেমন: শিরায় মাদকসেবী, যৌনকর্মী ইত্যাদি) মধ্যে বেশিরভাগই কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী। তাই কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরাই হলো মূল জনগোষ্ঠী যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম চালানো উচিত।

এইচআইভি বা হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস হচ্ছে এক ধরণের ভাইরাস যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আক্রান্ত করে, দূর্বল করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এই ভাইরাসের কারণে এইডস হয়। এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করার পর থেকে এইডস হিসেবে প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। তবে একবার এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করলে কোনো না কোনো সময় এইডস দেখা দেবেই। এইচআইভি ছোঁয়াচে না তবে যৌনবাহিত রোগের মতো এইচআইভি ভাইরাস একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়।

এইডস হলো একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটি এইচআইভি সংক্রমণের শেষ ধাপ। এইডস হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় ফলে শরীর নানা প্রকার সুযোগসন্ধানী সংক্রমণ, যেমন- নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইডস-এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু।

মানুষের শরীরে এইচআইভি যেভাবে ছড়ায় এবং যেভাবে ছড়ায় না

যেভাবে এইচআইভি ছড়ায়	যেভাবে এইচআইভি ছড়ায় না
• আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যেকোনো ধরণের যৌনমিলনের মাধ্যমে • এইচআইভি ভাইরাস আছে এমন কোনো ব্যক্তির রক্ত অন্য কারো শরীরে সঞ্চালন করা হলে • আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সূঁচ, সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে • শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে এমন যন্ত্রপাতি যেমনঃ স্কালপেল, সুঁই, রেজার ব্লেড, টাট্টু করার সুঁই, খাৎনা করার যন্ত্রপাতি সংক্রমিত অবস্থায় ব্যবহার করলে	• আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গ্লাসে পানি পান করলে • এইচআইভি ও এইডস সংক্রমিত লোকের ব্যবহৃত পুকুর বা পুলে গোছল করলে বা সাঁতার কাটলে • মশা বা অন্যান্য রক্তচোষা পোকামাকড়ের কামড় খেলে যা কিনা আগে সংক্রমিত মানুষকে কামড় দিয়েছে বা রক্ত খেয়েছে • এইচআইভি ও এইডস রোগীর সাথে সামাজিকভাবে বসবাস করলে • একই বাথরুম ব্যবহার করলে ঙ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হাত মেলালে • আক্রান্ত ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরলে বা সামাজিক চুম্বন করলে

যেভাবে এইচআইভি ছড়ায়	যেভাবে এইচআইভি ছড়ায় না
• আক্রান্ত মা হতে গর্ভকালীন সময়ে, প্রসবকালীন সময়ে বা বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে সন্তানের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে।	• হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে • একই খাবার খেলে বা কাপড়-চোপড় ও বাসনপত্র ব্যবহার করলে • আক্রান্ত ব্যক্তির লালা, চোখের জল বা ঘামের মাধ্যমে • একই সাথে খেলাধূলা বা একই স্কুলে পড়াশোনা করলে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কীভাবে এইচআইভি প্রতিরোধ করা যায়:

- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে
- বিবাহবহির্ভূত যৌনমিলন থেকে বিরত থাকলে
- স্ত্রী বা সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে
- যৌনমিলনের সবসময় কনডম ব্যবহার করলে
- কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংক থেকে এইচআইভি পরীক্ষিত রক্ত গ্রহণ করলে
- যেকোনো ধরনের ড্রাগ ব্যবহার থেকে বিরত থাকলে: শিরায় মাদক গ্রহণকারীর যেকোনো ধরনের সুঁইজাতীয় (সিরিঞ্জ) বস্তু ভাগাভাগি করা থেকে বিরত থাকলে; যেকোনো ধরনের যৌনবাহিত সংক্রমণ/প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ পরীক্ষা করতে হবে এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

ধাপ - ৫: সারসংক্ষেপ

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত রোগ ও করণীয় সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের ধারণা থাকা, তাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে সচেতন হলে তারা নিজের, পরিবারের, আত্মীয়-স্বজন ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) প্রজননতন্ত্র ও যৌনবাহিত সংক্রমণের কারণ কি?
২) কি কি লক্ষণ দেখা দিলে আমরা ধারণা করতে পারি যৌনবাহিত সংক্রমণ হয়েছে?
৩) কিশোর-কিশোরীরা কেন যৌনবাহিত সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে?
৪) এইচআইভি কীভাবে ছড়ায় এবং কীভাবে ছড়ায় না?
৫) এইচআইভিসহ যৌনবাহিত সংক্রমণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

অধ্যায় - ৭: কিশোরীদের ঋতুস্রাবকালীন ব্যবস্থাপনা এবং কিশোরদের স্বপ্নে বীর্যপাত

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কিশোরীদের মাসিক বা ঋতুস্রাব শুরু হয় - সে সম্পর্কে নিজের প্রস্তুতি, করণীয় এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিজেকে সুরক্ষার উপায়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে। একই সাথে এই সময়ে কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘুমের মধ্যে কখনও কখনও বীর্যপাত ঘটে সে সম্পর্কে করণীয় ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবে ও মেনে চলতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	মাসিক বা ঋতুস্রাব সম্পর্কিত তথ্য	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	
২.	ঋতুস্রাবকালীন সময়ে করণীয় ও এ সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া
৩.	অস্বাভাবিক ঋতুস্রাব ও করণীয়	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৪.	কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাব ব্যবস্থাপনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৫.	কিশোরদের স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

মাসিক বা ঋতুস্রাব (শুধুমাত্র ছাত্রীদের ক্লাসে আলোচনার জন্য)

কৈশোরে মেয়েদের (১০-১৪ বছর বয়সী) প্রতি মাসে জরায়ু থেকে যোনীপথে যে রক্তস্রাব বের হয়ে আসে, তাকে মাসিক ঋতুস্রাব বলে। এটা মেয়েদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির লক্ষণ এবং প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের পূর্বশর্ত। কিশোরীদের ক্ষেত্রে মাসিক ঋতুস্রাব তাদের বিশেষ শারীরিক পরিবর্তন; যেগুলো বিশেষভাবে ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন।

একজন কিশোরীর দু'টি ডিম্বাশয়ে (ওভারী) বয়ঃসন্ধিকালে তিন লাখ অপরিপক্ক প্রাথমিক ডিম্বানু থাকে। প্রতিমাসে ডিম্বাশয় হতে একটি করে পরিপক্ক ডিম্ব স্ফুটিত হয়। এভাবে প্রায় ৮৫০টি ডিম্ব সারাজীবনে বের হয়। ডিম্বাশয় হতে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন নিঃসরণ হয়। একজন নারী যতদিন সন্তান জন্মদানে সক্ষম থাকেন, ততদিন এই হরমোনগুলো গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হতে থাকে। এই হরমোনগুলি জরায়ুর উপরে কাজ করে ও ভ্রুণ তৈরী করে। ভ্রুণ তৈরী না হলে জরায়ুর ভিতরের পর্দা ২৮ দিনের মাথায় মাসিকের রক্ত হিসেবে বের হয়ে আসে। এই ২৮ দিনের চক্রটিকে ঋতুচক্র বলা হয়। এই সময় দু'টো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে:

১. একটি পরিপক্ক ডিম ডিম্বাশয় হতে বের হয় (ডিম্বস্ফুটন বা ওভুলেশন) এবং
২. জরায়ুর ভিতরের স্তর নিষিক্ত ডিম্ব গ্রহণের জন্য তৈরি থাকে।

ধাপ - ১: মাসিক বা ঋতুস্রাব সম্পর্কিত তথ্য

উপস্থাপক এই বিষয়ে আলোচনা অতিশয় কৌশলপূর্ণতার সাথে শুরু করবেন। কারণ, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার জন্য এখনও প্রস্তুত নয় এবং বিশেষ করে ছাত্রীরা এ বিষয়ে সরাসরি আলোচনায় কিছুটা বিব্রতবোধ করতে পারেন। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থাপক ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন, কৈশোর বয়সে মেয়েদের একটি বিশেষ শারীরিক পরিবর্তনের সূচনা হয় - সেটি কী? এরপর তাদের মাসিক/ঋতুস্রাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা সহায়ক তথ্য বিভিন্ন উপস্থাপনা সহায়িকার সাহায্যে আলোচনা ও ধারণা প্রদান করবেন।

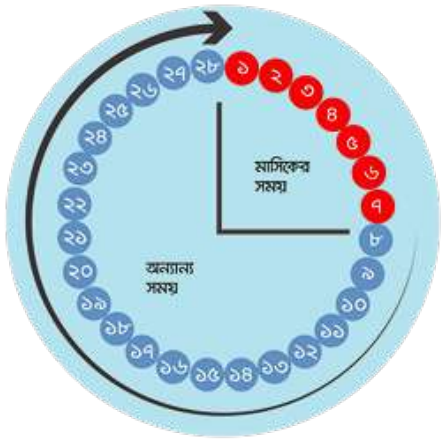

- মাসিক সাধারণত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সে শুরু হয়
- সাধারণত ২৮ দিন পরপর হয়
- মাসিক সাধারণত ৫ থেকে ৭ দিন থাকে। এ সময় সবরকম খাবার খাওয়া যায় এবং সুষম খাবার বেশি করে খেতে হয়
- মাসিক চলাকালীন স্বাভাবিক সব কাজ করা যায়
- এটি দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

ধাপ - ২: মাসিকের সময় করণীয় ও এ সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা

ছাত্রীদের প্রশ্ন করুন, মাসিক বা ঋতুস্রাবের সময় করণীয় সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? এ সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা কী? এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের পর আলোচনা সহায়ক তথ্যের সাহায্যে বিস্তারিত আলোচনা করুন ও ছাত্রীদের পরিষ্কার ধারণা প্রদান করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মাসিকের সময় করণীয়

- মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে
- নিয়মিত গোসল করতে হবে
- মাসিক হলে রক্ত যাতে পরনের কাপড়ে বা যেখানে সেখানে লেগে না যায় তার জন্য পরিষ্কার কাপড় বা স্যানেটারী প্যাড ব্যবহার করতে হবে
- কাপড় ব্যবহার করলে, মাসিকের কাপড় পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। কেননা ঘরের কোণে বা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখলে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুসহ পোকা-মাকড় বাসা বাঁধতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন রোগ বা সংক্রমণ হতে পারে

- মাসিকের সময় পুষ্টিকর ও প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে (যেহেতু শরীর থেকে অনেক রক্ত বের হয়ে যায়)
- দৈনিক কমপক্ষে ৩/৪ বার স্যানেটারী প্যাড বা কাপড় বদলাতে হবে। ব্যবহৃত প্যাড নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে
- এ সময় প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে হবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হবে
- মাসিক বন্ধ থাকলে বা একমাসে ২/৩ বার মাসিক হলে, প্রচুর রক্তক্ষরণ বা তলপেটে প্রচন্ড ব্যাথা হলে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে
- মেয়েদের মাসিক শুরু হলে মা বা পরিবারের বয়স্ক মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া ভালো
- পাশাপাশি নিজেকে অসুস্থ বা অশুভ মনে না করে এ বিষয়ে সচেতন থাকা।

স্যানিটারি ন্যাপকিন

সুতি কাপড়

সমাজের প্রচলিত ধারণা

মেয়েদের মাসিক নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেমন-

- মাসিক চলাকালে মেয়েরা দূষিত বা অপবিত্র হয়ে যায়
- এ সময়ে বাড়ির বা ঘরের বাইরে গেলে জ্বীন-ভুতে আছর করে
- এ সময়ে টক খাওয়া যাবে না, খেলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হবে
- এ সময়ে মাছ-মাংস খাওয়া যাবে না, খেলে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হবে
- মাসিক চলাকালে স্বামীর সাথে এক বিছানায় ঘুমানো যাবে না
- স্বামী বা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে খাবার তুলে দেয়া যাবে না
- মাসিক চলাকালে গোয়ালঘরে যাওয়া যাবে না
- চুল ছেড়ে বসতে বা চলাফেরা করতে পারবে না।

উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ই মাসিক সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা। মাসিকের সাথে মাছ খাওয়া বা টক খাওয়া ইত্যাদি কোন কিছু সম্পর্কিত নয়, বরং মাসিকের সময় জরায়ুর মুখ খোলা থাকে বলে এ সময়ে গোয়ালঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করলে জরায়ুতে সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকে। মাসিক প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক কাজের মত দেহের একটি সাধারণ ব্যাপার। এই সময় প্রত্যেক নারী তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু নিয়ম-কানুন আছে, যা আমরা সবাই জানি এবং মেনে চলি। এছাড়া মাসিক চলাকালীন সময়ে মেয়েরা অন্য সময়ের মত সব ধরনের স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে।

ধাপ - ৩: অস্বাভাবিক ঋতুস্রাব ও করণীয়

উপস্থাপক ছাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করুন যে, ইতোমধ্যে ঋতুস্রাবের বিষয়ে আলোচনায় তারা সহজ হয়ে এসেছে কি না। এ পর্যায়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমরা এর পূর্বে মেয়েদের ঋতুস্রাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমাদের জানা উচিত অস্বাভাবিক মাসিক বা ঋতুস্রাব কি? এর লক্ষণগুলো কি?

অস্বাভাবিক ঋতুস্রাব

- অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়া
- ৭ দিনের বেশী রক্তস্রাব হওয়া
- মাসে ১ বারের বেশী রক্তস্রাব হওয়া
- কালো কালো জমাট চাকার মত রক্ত পড়া
- তলপেটে তীব্র ব্যাথা অনুভূত হওয়া
- মাসিকের আগে ও পরে দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব হওয়া
- সাদা স্রাবের সঙ্গে চুলকানি হওয়া
- গায়ে জ্বর থাকা

মাসিকের সময় উপরের যেকোন জটিলতা হলে সেটাকে অস্বাভাবিক মাসিক বলে। তবে এতে ভয়ের কিছু নেই। এই ধরনের জটিলতায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া একান্ত দরকার।

অনিয়মিত মাসিকের কারণ: নারীদের মাসিক বন্ধ হওয়ার আগে, কোন হরমোনজনিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে, প্রজননতন্ত্রের কোন ধরনের সংক্রমণ হলে এবং হাইমন (hymen) বা যোনিচ্ছদ পর্দার গঠনগত সমস্যার কারণে মাসিক অনিয়মিত হতে পারে।

ধাপ - ৪: কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাব ব্যবস্থাপনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাবের বিষয়টি তাদের লেখাপড়া ও স্কুলের সাথে জড়িত। অনেক কিশোরী মাসিক ঋতুস্রাবের সময়, বিশেষ করে প্রথম ৩ দিন স্কুলে যায়না বা যেতে চায়না। এর কারণ হিসেবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে স্কুলের টয়লেটে কলের অব্যাহত পানি না থাকা এবং মাসিক ঋতুস্রাবের সময় সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব। ফলে, কয়েকদিনের অনুপস্থিতি কিশোরীদের লেখাপড়া ও ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে - এতে অনেক কিশোরী স্কুল থেকে ঝরে পড়ে; একসময় তারা বাল্যবিয়ের শিকার হয়। অনেক কিশোরীদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত অকালে হারিয়ে যায়।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার দায়িত্ব পালন প্রয়োজন। যেহেতু, কিশোরীদের জন্য মাসিক ঋতুস্রাব একটি নিয়মিত ঘটনা, সেজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যাতে তারা এ সময় স্কুলে থাকে ও পড়াশুনায় মন দিতে পারে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে নিচের সহায়তাসমূহ দিতে পারে-

- কিশোরীদের জন্য আলাদা ও ঋতুস্রাব-বান্ধব টয়লেট স্থাপন করা যেখানে কলের অব্যাহত পানি থাকবে ও ঋতুস্রাবের কাপড়/প্যাড ফেলার জন্য ঢাকনাযুক্ত বাক্স/বালতি থাকবে
- নারী শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে তিনি/তারা কিশোরীদের ঋতুস্রাব ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে
- স্কুলে থাকা অবস্থায় অনেক সময় কিশোরীদের প্রথম ঋতুস্রাব হয় অথবা হঠাৎ করে, অপ্রস্তুত অবস্থায় শুরু হয়ে যায় - তখন তাদের স্যানেটারী ন্যাপকিন প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের স্যানেটারী ন্যাপকিন দিতে পারে

- এছাড়া ঋতুস্রাবের সময় কিশোরীদের তলপেটে ব্যথা হয় - এজন্য প্রয়োজন হলে তাদের ব্যথানাশক বড়ি (যা স্কুলের 'ফার্স্ট এইড বক্সে' রাখতে হবে) ও মানসিকভাবে সাহস দিতে হবে
- কিশোরীদের স্কুলকে ঋতুস্রাব-বান্ধব করার জন্য সকল শিক্ষক ও এসএমসি-এর সদস্যদের এ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দিতে হবে যাতে স্কুলের পাশাপাশি বাড়ীতেও তারা সহায়তা পেতে পারে।

ধাপ - ৫: কিশোরদের স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নেবীর্যপাত

ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করুন, স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং এ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না? প্রশ্নোত্তরের পর আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া সহযোগে এ বিষয়ে আলোচনা ও ধারণা প্রদান করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মানুষের জীবনে কৈশোরকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যখন তারা শিশু বা বড় কোনটাই নয়। এ সময়ে কিশোর-কিশোরীদের নানাবিধ শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনও ঘটে। এই সময় হতেই ছেলেদের অণ্ডকোষে শুক্রাণু তৈরি হয়। ফলে এই বয়সে কিশোরদের ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়া শুরু হয় যাকে স্বপ্নে বীর্যপাত বলে। বিষয়টি স্বাভাবিক, কোন দোষের বিষয় নয়।

স্বপ্নে বীর্যপাত

বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের প্রভাবে কিশোরদের শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বীর্য তৈরী হয় এবং বীর্যথলিতে তা জমা হতে থাকে। এই বীর্য জমা হতে হতে ঘুমের মধ্যে কোন উত্তেজনামূলক স্বপ্ন দেখলে তা বের হয়ে আসতে পারে। একেই স্বপ্নে বীর্যপাত বলা হয়। এটি সবার জন্য একরকম হয় না - কারো ক্ষেত্রে বেশী, কারো ক্ষেত্রে কম আবার কারো ক্ষেত্রে না-ও হতে পারে।

ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়ার পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পরিষ্কার কাপড় পড়া এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা উচিত। পাশাপাশি সুষম খাবার খাওয়া ও এই বিষয়টি সম্পর্কে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর কাছ থেকে বিশদভাবে জানা উচিত।

কিশোরদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি

- প্রত্যহ যৌনাঙ্গ ধোয়া
- সুতির অন্তর্বাস ব্যবহার করা উচিত। কৃত্রিম বস্ত্রে তৈরি অন্তর্বাস জলীয় পদার্থ শোষণ করতে পারে না এবং উষ্ণতা বাড়িয়ে তোলে
- অন্তর্বাস প্রতিদিন বদল করা। যারা ক্রীড়া বা শারীরিক পরিশ্রমের সাথে যুক্ত তাদের আরও ঘন ঘন অন্তর্বাস বদল করা উচিত
- প্রতিদিন অন্তর্বাস ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে।

ধাপ - ৬: সারসংক্ষেপ

কিশোরীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে ধারণা গঠন ও সচেতনতা তার নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খুবই জরুরী, কারণ এই শারীরিক প্রক্রিয়া মেয়েদের জীবনচক্রের একটি অতি স্বাভাবিক ও আবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। এ সম্পর্কে প্রস্তুতি তার নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে পাশাপাশি সে তার বান্ধবী এবং সমবয়সী আত্মীয়-স্বজনদেরও এ সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরও ধারণা গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

কিশোররাও স্বপ্নে বীর্যপাত এই বয়সের একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে মেনে নিয়ে অহেতুক লজ্জা ও ভীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। একই সাথে স্বপ্নে বীর্যপাত সম্পর্কে ধারণা গঠন করে তার বন্ধুদের এবং সমবয়সী আত্মীয়-স্বজনদেরও সচেতন করে তুলতে পারে।

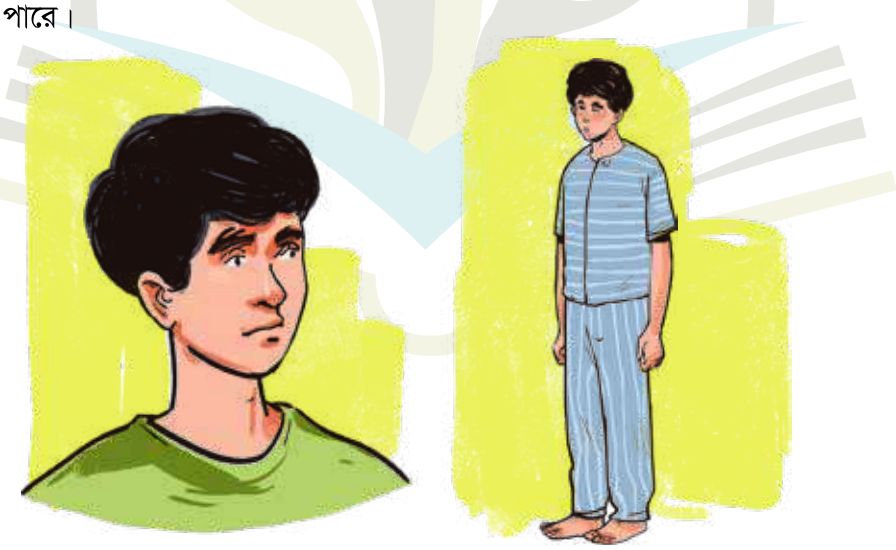

ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) মাসিক বা ঋতুস্রাব কি? এ সম্পর্কে তোমার ধারণা বল।

২) মাসিক বিষয়ে সমাজের প্রচলিত ধারণা কি? মাসিকের সময় কি করতে হয়?

৩) কীভাবে বুঝা যাবে যে, অস্বাভাবিক মাসিক হচ্ছে? অনিয়মিত মাসিকের কারণ কি?

ছাত্রদের জন্য প্রশ্ন:

১) স্বপ্নে বীর্যপাত কি? এসম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো বল?

২) কিশোরদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিগুলো আলোচনা কর?

অধ্যায় - ৮: পরিকল্পিত পরিবার ও মাতৃস্বাস্থ্য

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কি, কীভাবে কাজ করে এবং মাযের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	পরিকল্পিত পরিবার কী ও কেন প্রয়োজন	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	সন্তান নেয়ার সঠিক সময়	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.	মাতৃস্বাস্থ্য	২০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	উন্মুক্ত আলোচনা	

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: পরিকল্পিত পরিবার কী ও কেন প্রয়োজন

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন, পরিকল্পিত পরিবার বলতে কী বোঝায় এবং কেন এর প্রয়োজন। এরপর নিচের সহায়ক তথ্যের সাহায্যে প্রশ্ন করুন ও আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বিয়ের আগে পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে জানতে বা কারো সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করতে অনেকেই লজ্জা পায়। কিন্তু সুন্দর ও পরিকল্পিত ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই বিয়ের আগে পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে জানা উচিত। এতে লজ্জার কিছু নেই। কারণ এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে সন্তান সংখ্যা, কখন সন্তান নেয়া উচিত, সে ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

পরিকল্পিত পরিবার কী?

জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠন করাই হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবার। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে চিন্তা করবেন তারা কখন সন্তান নিতে চান এবং সন্তান নেবার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি তাদের রয়েছে কিনা। যেমন- বয়স ২০ বছর হবার আগে মেয়েদের শরীর মা হওয়ার মতো পূর্ণতা পায় না তাই ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান নিলে মা ও শিশু দু'জনেরই স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। আবার দুই সন্তানের মাঝে কমপক্ষে ৩ বছর বিরতি দেয়া উচিত, এতে মায়ের শরীর আবার সন্তান ধারণে উপযোগী হয়ে উঠে।

পরিকল্পিত পরিবার কী?
জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠন করাই হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবার।

এছাড়া বিয়ের পর পরস্পরকে বোঝার ও জানার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। সন্তান হওয়ার পর তাকে আদর-যত্ন দিয়ে বড় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং সন্তান লালন পালন করার মতো যথেষ্ট আয়-রোজগার আছে কিনা সেটাও ভেবে সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা করা উচিত। অর্থাৎ পরিকল্পিত পরিবার হচ্ছে নিজেদের পরিকল্পনা ও ইচ্ছে অনুযায়ী পরিবার গঠন করা।

পরিকল্পিত পরিবার কেন প্রয়োজন?

- স্বামী স্ত্রীর পছন্দমতো সময়ে এবং সীমিত সংখ্যায় সন্তান নিতে সাহায্য করে
- শিশু ও মায়ের জীবনের ঝুঁকি ও মৃত্যু হার কমায়
- ঘন ঘন গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস করে
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বাড়ায়
- স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক চাপ কমায়
- পরিবারের সকলের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সহমর্মিতা ও সমঝোতা বাড়ায়।

ধাপ - ২: সন্তান নেয়ার সঠিক সময়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন সন্তান নেয়ার সঠিক বয়স সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? প্রশ্নোত্তর শেষে সহায়ক তথ্যের সাহায্যে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

সন্তান নেয়ার সঠিক সময়

২০ বছর বয়সের পর সন্তান নিলে মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যদি এ বয়সের আগে কোন মেয়ে গর্ভবতী হয়, তবে তার নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা হয়। কারণ ২০ বছরের পূর্বে মেয়েদের কোমরের হাড় পুরোপুরি বাড়ে না, তাই গর্ভবতী হলে পেটে সন্তান বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট জায়গা পায় না। ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয় আর এসব কম ওজনের শিশুর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কম হয়।

অল্পবয়সে মেয়েদের প্রসবের রাস্তা ছোট থাকে তাই সন্তান প্রসবের সময় অতিরিক্ত চাপের ফলে এ রাস্তা ছিঁড়ে যায়, অনেক সময় বাচ্চা বের হতেও অনেক কষ্ট হয়। এ বয়সে মা হলে মা ও সন্তানের মৃত্যুর আশংকা অনেক বেশি থাকে।

এছাড়া অল্পবয়সে মেয়েরা মানসিকভাবে পুরোপুরি বড় হয় না। সন্তানের যত্ন ও লালন-পালন করতে হয় কীভাবে তা অল্পবয়সী মেয়েরা তেমন বুঝতে পারে না আর মা হবার মত দায়িত্ববোধও তৈরি হয় না। তাই ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান নেয়া উচিত নয়।

২০ বছর বয়সের পর মেয়েদের সন্তান নেবার সঠিক সময়। ২০ বছর বয়সের পর সন্তান নিলে মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ধাপ - ৩: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কাকে বলে এবং পদ্ধতিগুলো কি কি - এ সম্পর্কে উপস্থাপক প্রশ্নোত্তর, সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কি

পরিবারের সকলের জন্য ভালো স্বাস্থ্য, পরিবারের সবার মধ্যে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য পরিবার ছোট রাখা প্রয়োজন। পরিবার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হচ্ছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এড়াতে সাহায্য করে।

দেরিতে সন্তান চাইলে বা আর কোনো সন্তান না চাইলে বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করলে গর্ভধারণ হয় না।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে?

পরিবার পরিকল্পনার এই পদ্ধতিগুলো মূলত: ছেলেদের শুক্রাণুর সাথে মেয়েদের ডিম্বাণুর মিলিত হওয়াকে বাধা দেয়। এর ফলে মেয়েদের গর্ভধারণ হয় না।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রকারভেদ

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলোকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়:

১. আধুনিক পদ্ধতি
২. সনাতন পদ্ধতি

আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দু'রকম: অস্থায়ী এবং স্থায়ী পদ্ধতি।

অস্থায়ী পদ্ধতি: যে পদ্ধতি ব্যবহার বন্ধ করে সন্তান নিতে চাইলে আবার গর্ভধারণ করা যায়।

- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন - স্বল্পমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
- ইমপ্ল্যান্ট ও আইইউডি (কপার-টি) - দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
- ল্যাম (ল্যাকটেশনাল এ্যামনোরিয়া) বা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো নির্ভর পদ্ধতি।

স্থায়ী পদ্ধতি: যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে রোধ করা যায়।

- পুরুষদের জন্য এনএসভি
- নারীদের জন্য টিউবেকটমী।

ইনজেকশন

কনডম

এন.এস.ভি

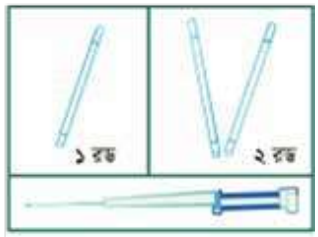

ইমপ্ল্যান্ট

খাবার বড়ি

খাবার বড়ি

আইইউডি

ধাপ - ৪: মাতৃস্বাস্থ্য

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন, মাতৃস্বাস্থ্য বলতে তারা কী বোঝে এবং কেন মায়ের স্বাস্থ্যেও যত্ন নেয়া প্রয়োজন। এরপর নিচের সহায়ক তথ্য ও স্লাইড সহযোগে প্রশ্ন করুন ও আলোচনা করুন।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেলেও বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনও অনেক বেশী। তার কারণ হিসাবে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে দক্ষ সেবাদানকারীর নিকট থেকে সেবা না নেওয়া ও সেবা না পাওয়া এবং বাড়িতে প্রসবকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। যদিও মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার জন্য যে সুযোগ রয়েছে তার ব্যবহারও খুব অপ্রতুল; তারপরও অশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কুসংস্কার, নারীর ক্ষমতায়নের অভাব, মা ও নবজাতকের মৃত্যুর জন্যে অনেকাংশে দায়ী।

উল্লেখ্য যে, কিশোরী মায়েদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশী।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে করণীয়:

গর্ভজনিত জটিলতায় আক্রান্ত নারীদের জরুরী প্রসূতি সেবা পেতে তিন ধরনের বিলম্ব হয়ে থাকে।

১) চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব:

বেশীরভাগ পরিবারে নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা। এখনও অনেক পরিবারের সদস্যরা একজন নারীর মা হওয়ার বিষয়টি দশটি সাধারণ বিষয়ের মত মনে করে। গর্ভজনিত জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, লোকবলের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরী হয়ে যায়।

২) সেবাকেন্দ্রে পৌঁছতে বিলম্ব:

জরুরী অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যানবাহন, টাকা-পয়সা যোগাড় থাকে না। আবার বাড়ি হতে সেবাকেন্দ্র দূরে হওয়ায় পৌঁছতে দেরী হয়।

৩) সেবাকেন্দ্রে সেবা পেতে বিলম্ব:

ডাক্তার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী, ঔষধপত্র, রক্ত ও যন্ত্রপাতির অভাবে এবং সেবাপ্রদানকারীদের সেবামূলক মনোভাব ও সহযোগিতার অভাবে চিকিৎসা কেন্দ্রেও অনেক সময় চিকিৎসা শুরু করতে দেরী হয়।

মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা তথা নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার জন্য গর্ভবতী মা, তাদের পরিবার এবং সমাজকে সচেতন করতে স্বাস্থ্যকর্মীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর্মী পরিবারগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে, তথ্য দিয়ে এ বিষয়ে সমাজের সবার ধারণা, মানসিকতার আচরণে পরিবর্তন আনতে পারেন।

প্রসবের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি:

প্রসব-পরিকল্পনার মাধ্যমে একজন গর্ভবতী নারী এবং তার পরিবারের সদস্যরা (যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন) মা ও নবজাতকের সুস্থতা নিশ্চিত করতে প্রসবের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিবেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিগুলো হচ্ছে:

- হাসপাতালে যাওয়ার জন্য যানবাহন ও সাথী ঠিক করে রাখা
- আগে থেকেই প্রসবের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ প্রসবকারী অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বিপদে কোন যানবাহনে করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবেন তা ঠিক করে রাখা
- গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে রাখা
- রক্তের গ্রুপ জেনে রাখা ও রক্তের প্রয়োজনে আত্নীয়-স্বজনদের প্রস্তুত রাখা।

পুষ্টিকর খাবার:

- গর্ভাবস্থায় মাকে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি করে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খেতে হবে (খাবারের তালিকায় সাধ্যমতো ফল-মূল, সবুজ শাক-সব্জি, ডাল, সীম, মাংস, ডিম, দুধ, ছোটমাছ ইত্যাদি থাকতে হবে)
- গর্ভাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে
- প্রসূতি মাকে বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে (একজন গর্ভবতী মাকে দিনে ৫-৬ বার খাবার দিতে হবে)।

মাতৃত্বকালীন অপুষ্টি মায়ের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, এমনকি অনেক সময় মা ও নবজাতকের মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয়। শিশুবিয়ে, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, কিশোরী মায়ের পুষ্টিহীনতা, রক্তস্বল্পতা, গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, সুচিকিৎসার অভাব প্রভৃতি কারণে নারীদের নিরাপদে মা হওয়ার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। সুতরাং, নবজাতক ও মাতৃমৃত্যু রোধে গর্ভধারণের আগে হতেই নারীদের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে হলে সমাজের সব মানুষকে সচেতন হতে হবে।

গর্ভকালীন সময়ে করণীয়:

- গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে ৪ বার শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনে আরও বেশী পরীক্ষা করতে হতে পারে
- গর্ভের সাত থেকে নয় মাস ঘনঘন শারীরিক পরীক্ষা করা জরুরী
- সাধ্যমত সবুজ শাক-সবজি, হলুদ ফল-মূল, ডাল, সীম, মাংস, ডিম, দুধ, ছোটমাছ খেতে হবে; নিয়মিত যা খান তার চেয়ে একটু বেশী খেতে হবে
- গর্ভধারণের পর টিটি ইনজেকশন নিতে হবে
- এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীর নিকট গর্ভ ও প্রসব বিষয়ে বিস্তরিত পরামর্শ নিতে হবে
- ভারি কিছু তোলা ও ভারি কাজ করা হতে বিরত থাকতে হবে
- দিনের বেলা কমপক্ষে ১ ঘন্টা শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে
- গর্ভ ও প্রসবের সময় কোন জটিলতা দেখা দিলে দ্রুত কাছের হাসপাতালে যেতে হবে।

গর্ভবতীর পরিবার হতে যে সহযোগিতা প্রয়োজন:

- গর্ভাবস্থায় বেশী করে সুষম খাবার দিন, ভারি কাজ করতে নিষেধ করুন ও দিনের বেলা কমপক্ষে ১ ঘন্টা শুয়ে বিশ্রাম নিতে বলুন
- কোথায় এবং কার কাছে প্রসব করাবেন যোগাযোগ করে তা ঠিক করে রাখুন
- গর্ভ ও প্রসবের সময় জটিল অবস্থাগুলো জেনে রাখুন
- যেকোন সময় গর্ভবতীর জটিল অবস্থা দেখা দিতে পারে; সেক্ষেত্রে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন এবং কোন যানবাহনে করে হাসপাতালে যাবেন তা ঠিক করে রাখুন
- গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে রাখুন
- প্রসবের পর বাচ্চাকে শাল দুধ দিন এবং ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে সাহায্য করুন

- প্রসবের ছয় মাসের মধ্যে প্রসূতিসহ শিশুকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে পরীক্ষা করান
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিতে উৎসাহিত করুন
- শিশুকে টিকা দিন
- গর্ভবতী ও প্রসুতির সহযোগিতায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন।

মনে রাখতে হবে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে।

ধাপ - ৫: সারসংক্ষেপ

পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্বধারণা তাদের ভবিষ্যত বিবাহপূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পারিবারিক জীবন গঠনকে প্রভূতভাবে সাহায্য করবে। একই সাথে মাতৃস্বাস্থ্য সর্ম্পকেও তাদের ধারণা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পারিবারিক জীবনে প্রবেশের সময় সাহায্য করবে। এই পূর্বধারণা, মানসিক প্রস্তুতি ও পারিবারিক জীবনে তার চর্চার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যত জীবনকে আরো সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে পারবে।

ছাত্রদের জন্য প্রশ্ন:

১) পরিকল্পিত পরিবার বলতে কী বোঝ? কেন পরিকল্পিত পরিবার গঠন করতে হবে?
২) পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কি? কীভাবে কাজ করে? কয়েকটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির নাম বল?
৩) মেয়েদের সন্তান ধারণের সঠিক বয়স কত? নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে করণীয়গুলো কি?
৪) প্রসবের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি কেন প্রয়োজন?
৫) গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতীর করণীয়গুলো কি? এ সময়ে পরিবার হতে কি কি সহযোগিতা প্রয়োজন?

বাল্যবিয়ে ও জেন্ডার

অধ্যায় - ৯: বাল্যবিয়ের কুফল ও করণীয়

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বাল্যবিয়ে কী, বাল্যবিয়ের কারণ ও কুফল বা পরিণতি কী এবং বাল্যবিয়ে রোধে করণীয় কী সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	বাল্যবিয়ে কী ও এর কারণ	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
২.	বাল্যবিয়ের পরিণতি, কৈশোরে গর্ভধারণের কুফল এবং কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে করণীয়	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৩.	বাল্যবিয়ের শাস্তি	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৪.	বাল্যবিয়ে রোধে করণীয়	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৫.	বাল্যবিয়ে রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তা	১০ মিনিট	আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: বাল্যবিয়ে কী ও এর কারণ

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন বাল্যবিয়ে সম্পর্কে তাদের ধারণা কী, এর কুফল এবং প্রতিরোধে তাদের করণীয় সম্পর্কে তারা কী জানে? ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং প্রশ্নোত্তর ও স্লাইড প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্য বিয়ে

বাল্যবিয়েকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র আর সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে, বিষয়টি একটি জাতীয় সমস্যা, যার প্রতিকার প্রয়োজন। বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে এমন একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা যা নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। বাল্যবিয়ের উৎপত্তি সমাজের অনেক গভীরে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার ও নানাপ্রকার ধ্যান-ধারণা এর ভিত্তি।

বাল্যবিয়ে কী?

বর-কনে দুজনেরই বা একজনের বয়স বিয়ের আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বয়সের কম হলে অর্থাৎ বিয়েতে মেয়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে অথবা ছেলের বয়স ২১ বছরের নিচে থাকলে তা আইনের দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে বলে চিহ্নিত যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন-২০১৭ অনুযায়ী বাল্যবিয়ে হচ্ছে- 'এইরূপ বিয়ে যাহার কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক'।

দেশের বর্তমান বিবাহ আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ ও ছেলেদের বয়স ২১ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও অল্পবয়সে অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হওয়া আমাদের দেশের জন্য একটি সাধারণ ঘটনা। ২০১৭ সালের BDHS-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৬.৩ বছর।

বাল্যবিয়ের কারণ

- **বাল্যবিয়ে আইন সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও সচেতনতার অভাব:**
  বিবাহ আইন সম্পর্কে ধারণা কম থাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব
- **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় কুসংস্কার:**
  কখনো কখনো ভালো বর/পাত্র পেলেও বাবা-মায়েরা আগে বিয়ে দিয়ে দেন। মনে করেন এত ভাল পাত্র পরে না-ও পেতে পারেন। কখনো কখনো সামাজিক চাপে পড়ে বাবা-মা অল্পবয়সে মেয়ের বিয়ে দেন।
- **দারিদ্র্যতা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট:**
  দরিদ্রতার কারণেও অনেক বাবা-মা অল্পবয়সে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেন। সাধারণত বরপক্ষ কম বয়সী মেয়েকে পাত্রী হিসেবে বেশী পছন্দ করে এবং যৌতুক কম চায়। দারিদ্র ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে পিতা-মাতা কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা হিসাবে দেখে তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে কন্যাদায় মুক্ত হতে চায়।
- **সঠিক শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব:**
  কিছু কিছু অভিভাবক মনে করেন যে, মেয়েদের বয়স বেশি হলে বিয়ের জন্য ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না। এছাড়াও তাদের বাল্যবিয়ের পরিণতি ও কম বয়সের গর্ভধারণের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা না থাকা।
- **সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা:**
  আমাদের সমাজে অনেক বাবা-মা তাদের মেয়েদেরকে নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এ জন্য উপযুক্ত পাত্র পেলেই তারা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। তারা মনে করেন মেয়েদের বিয়ে দিলে সন্ত্রাসী বা বখাটে ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

- **জেন্ডার বৈষম্য:**
  সামাজিক প্রথাগতভাবে পিতা-মাতা মনে করেন কন্যা সন্তান বড় হয়ে শশুর-বাড়ি চলে যাবে এবং পিতা-মাতার দেখাশুনা করতে পারবে না। তেমনি ছেলে সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতার দেখাশুনা করবে। ফলে ছোট বেলা হতেই কন্যা সন্তান বৈষম্যের শিকার হয় এবং যত তাড়াতাড়ি পারে বিয়ে দিয়ে দেন।
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার না থাকা।

কারণ যাই হোক না কেন, অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দিলে সে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে যা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ২: বাল্যবিয়ের পরিণতি ও কৈশোরে গর্ভধারণের কুফল এবং কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে করণীয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন বাল্যবিয়ের পরিণতি ও কৈশোরে গর্ভধারণের কুফলগুলো কি কি। ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং নিচের সহায়ক তথ্য অনুযায়ী আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিবাহের বেশ কিছু ক্ষতিকারক দিক হলো:

- কিশোর-কিশোরীদের সহজাত উচ্ছ্বাস, বৃদ্ধি এবং গতিশীলতাকে থামিয়ে দেয়
- বিবাহিত কিশোরীরা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং লেখাপড়া শেষ করতে পারেনা ফলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়
- বাল্যবিয়ের কারণে কিশোরীদের পক্ষে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণসমূহের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাব তৈরি হয় যার ফলে নিজস্ব সমস্যা সমাধানে দক্ষতার অভাব থেকেই যায় এবং কোন বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় না
- বিয়ের পর সন্তান ধারণের জন্য পারিবারিক চাপ বেড়ে যায়, অর্থাৎ বাল্যবিয়ে হলে অবধারিতভাবেই কিশোরী বয়সেই গর্ভধারণ হয়ে থাকে
- গর্ভধারণের ফলে মেয়েরা অপুষ্টিতে ভোগে এবং গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়
- অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান প্রসবের কারণে মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়
- অপরিণত, অপরিপক্ক, অপুষ্ট ও স্বল্প ওজনের শিশুর জন্মদান করে এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে
- প্রসব ও প্রসব পরবর্তী জটিলতায় ভোগে এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরী হয়, ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ও আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে
- পরিকল্পিত পরিবার গঠনের ধারণা থাকে না, যার ফলে অধিক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা তৈরি হয়
- নারীরা অধিক মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হয়
- অধিকার সম্পর্কে অসচেতন থাকে
- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে না
- অল্পবয়সি পুরুষ সংসারের দায়িত্ব নিতে না পারায় দাম্পত্য কলহ বাড়ে এবং বহুবিবাহের হার বৃদ্ধি পায়।

কিশোরীদের মাতৃত্বজনিত ঝুঁকি

কৈশোরে গর্ভধারণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এ সময় কিশোরীর নিজেরই শারীরিক বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকে, তাই তার পুষ্টিসহ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ তখনও চলতে থাকে। এ অবস্থায় গর্ভধারণ করলে কিশোরী মা ও শিশু উভয়ই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। গর্ভাবস্থায় কিশোরীর সাথে সাথে তার মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তানেরও নানা প্রকার পুষ্টির দরকার হয়। অথচ এ সকল সেবা এবং পুষ্টি কিশোরীর জন্য সবসময় পাওয়া সচরাচর সম্ভব নয়।

কৈশোরে সন্তান ধারণ এবং জন্মদানের ক্ষেত্রে মা এবং সন্তান যে ধরণের ঝুঁকিতে থাকতে পারে তা হলো-

- গর্ভজনিত উচ্চ রক্তচাপ
- গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতা
- প্রি-একলাম্পশিয়া
- বাধাগ্রস্ত প্রসব
- মৃত সন্তান প্রসব
- সময়ের আগে সন্তান জন্মদান
- কম ওজনের সন্তান জন্ম দেয়া
- প্রসব পরবর্তী বিষণ্নতা
- শিশু পরিচর্যার অনভিজ্ঞতা ও বুকের দুধের অপর্যাপ্ততা।

ধাপ - ৩: বাল্যবিয়ের শাস্তি

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্যবিয়ের শাস্তি সম্পর্কে ধারণা দিবেন। প্রশ্নোত্তর ও স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনার পর এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানতে চান।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিবাহের শাস্তি

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে তিন ধরনের বিয়ে অপরাধ বলে ধরা হয়েছে:

১. অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়ে
২. প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কের বিয়ে
৩. অপ্রাপ্তবয়স্ক পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক কর্তৃক বিবাহ নির্ধারণ বা বিয়েতে সম্মতি দান।

বাল্যবিয়ে আইনের দৃষ্টিতে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আইনে শিশু বিবাহকারীর শাস্তি, বিয়ে সম্পন্নকারীর শাস্তি, অভিভাবকের শাস্তি - এই তিন ভাগে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বাল্যবিবাহের জন্য শাস্তি পাবেন- শিশু (কন্যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি) বিবাহকারী পুরুষ, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকারী কাজী, অভিভাবকসহ বাল্যবিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাল্যবিয়ের শাস্তি হল:

- "প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন"
- "অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন"
- "পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি আইনগতভাবে বা আইনবহির্ভূতভাবে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোনো কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর ও অন্যূন ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন"
- "কোনো ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর ও অন্যূন ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"

বাল্যবিয়ে একটি বেআইনী বিয়ে। তাই বাল্যবিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেলে তা বাতিলযোগ্য। কোন নারীর ১৮ বছর পূর্ণ না হলে এবং তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে হলে তিনি মুসলিম বিবাহ বাতিল আইন, ১৯৩৯ অনুযায়ী আদালতে বিয়ে বাতিলের আবেদন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে-

১. মেয়েটি যদি স্বামীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন না করে অর্থাৎ সহবাস না করে
২. মেয়েটির বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এবং ১৯ বছর পার হওয়ার আগে বিয়েকে অস্বীকার করতে হবে।

ধাপ - ৪: বাল্যবিয়ে রোধে করণীয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন বাল্যবিয়ে রোধে তাদের করণীয় কী আছে? ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিয়ে কিশোরীর জীবনে চরম বিপদ ডেকে আনে - কারণ, বিয়ের পরপরই কিশোরী গর্ভধারণ করে যা তার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসময় কিশোরীর নিজেরই শারীরিক বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকে যা গর্ভধারণের জন্য উপযুক্ত নয়।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করতে যা করতে হবে:

- বাল্যবিয়ে রোধে জন্মনিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে বিয়ের সময় জন্ম সনদ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে এ বিষয়ে কাজিকে সচেতন করতে হবে
- বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে কিশোরী ও নারীদেরকে সচেতন করতে হবে
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে
- কাজী ও ইমামদেরকে বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে
- সামাজিকভাবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য বিশেষ করে নারী সদস্যদের নিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবাইকে সচেতন হতে হবে
- ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনকে বাল্যবিবাহ নিরোধে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে
- বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে কাজী, অভিভাবক ও জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে
- বাল্যবিবাহ ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে
- বাল্যবিবাহ হলেও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার ও দেরিতে সন্তান গ্রহণে কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতন করা
- কিশোর-কিশোরীদের জন্য উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
- 'বাল্যবিবাহ' নিয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে আলোচনা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করা
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ধাপ - ৫: বাল্যবিয়ে রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্যবিয়ে রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তার জন্য কীভাবে, কাদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আলোচনার সহায়ক তথ্য স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিবাহ রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তা

স্থানীয়ভাবে নিচের সংগঠনগুলো বাল্যবিয়ে রোধে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে:

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা ও পুরুষ মেম্বার
- পৌরসভার চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার
- নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
- জেলা প্রশাসক
- জেলা জজের নেতৃত্বে আর্থিকভাবে অসহায়দের সেবাদান কর্তৃপক্ষ
- নিকটস্থ এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা এ বিষয়ে কাজ করছেন
- মানবাধিকার সংগঠনসমূহ
- মহিলা অধিদপ্তরের আইন সহায়তা সেল।

জরুরি সহায়তার জন্য নিচের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে:

বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং বা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে	জরুরি পুলিশী সাহায্যের জন্য	পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণে
১০৯	৯৯৯	১৬৭৬৭

ধাপ - ৬: সারসংক্ষেপ

বাল্যবিয়ের কুফল, পরিণতি এবং বাল্যবিয়ে রোধে করণীয় সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা, তাদের ভবিষ্যত জীবন গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠনের পূর্বশর্ত এবং ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, সে জন্য সংসার পরিচালনার দায়িত্ব পালনসহ আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ অর্জন করাও বিয়ের পূর্বশর্ত। কিশোর-কিশোরীরা সচেতন হয়ে নিজে উপযুক্ত সময়ে ও যথাযথ সামর্থ অর্জন করে বিয়ে করবে এবং পরিবার ও সমাজের অন্যদেরও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

ছাত্রদের জন্য প্রশ্ন:

১) বাল্যবিয়ে কী? কি কারণে বাল্যবিয়ে হতে পারে?
২) বাল্যবিয়ের খারাপ দিকগুলো কি কি? কিশোরী মাতৃত্বের ঝুঁকি বেশী কেন?
৩) বাল্যবিয়ের শাস্তি কি? কিভাবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করা যায়?
৪) স্থানীয়ভাবে কোন কোন সংগঠন বাল্যবিয়ে রোধে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে? জরুরি সহায়তার জন্য কোন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে?

অধ্যায় - ১০: জেন্ডার: বৈষম্য ও এর প্রতিকারে করণীয়

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই সেশন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থানের বৈষম্য ও অসমতা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করবে যা তাদের এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	জেন্ডার: নারী-পুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
২.	জেন্ডার ও সেক্স	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৩.	জেন্ডার ভূমিকা	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৪.	জেন্ডার বৈষম্য	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৫.	জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপায়	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড মাল্টিমিডিয়া
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: জেন্ডার: নারী-পুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, জেন্ডার সম্পর্কে তাদের কি ধারণা এবং কেন এই বিষয়ে জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিচের সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এই বিরাট জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। অথচ দেখা যায়, সামাজিক রীতিনীতি বিশেষত জেন্ডার বৈষম্যের কারণে জীবনের সকল পর্যায়ে পুরুষের তুলনায় নারীরা পিছিয়ে থাকে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন কন্যাশিশু জন্মের পর থেকেই অবহেলা ও বৈষম্যের মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে। এই জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে প্রয়োজন এ বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের সচেতনতা, আর একজন কিশোর/কিশোরী হিসাবে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া ও অন্যকে সচেতন করে তোলা তোমাদেরও দায়িত্ব।

জেন্ডার কী?

জেন্ডার একটি ইংরেজী শব্দ। জেন্ডার-এর বাংলা শব্দ 'লিঙ্গ' হলেও সাধারণত 'জেন্ডার' শব্দটিই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজে নারীর সমঅধিকার আদায়, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মানো ও নারী হিসাবে সুস্থজীবন যাপনের জন্য অনেকের মত জেন্ডার-এর মূল ধারণাটি সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদেরও অবগত হতে হবে।

জেন্ডার বলতে একটি ছেলে ও মেয়ের মাঝে শারীরিক পার্থক্যকে বোঝায় না। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সমাজ কর্তৃক নারী ও পুরুষের ভূমিকা, চাল-চলন, অধিকারের যে পার্থক্য তৈরী করা হয় তাকে জেন্ডার বলে, অর্থাৎ নারী পুরুষের সামাজিক পরিচয়, তাদের সম্পর্ক এবং তাদের ভূমিকাই হলো জেন্ডার।

নারী-পুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

- সন্তান লালন পালন এবং বাড়ির ভিতরের কাজগুলো সাধারণত নারীদের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়
- অর্থ উপার্জন, নেতৃত্ব প্রদান, সামাজিক কাজকর্মকে পুরুষের কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়
- পুরুষকে পরিবার ও সমাজের অভিভাবক হিসাবে বিবেচনা করা হয়
- নারীকে সাধারণত পরিবার ও সমাজের অভিভাবক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না
- পরিবার ও সমাজে একজন পুরুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানের সুযোগ পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না
- নারীদের তুলনায় পুরুষের কার্যক্রমকে সামাজিকভাবে বেশি মূল্যায়ন করা হয়
- সমাজে ছেলে শিশুদের বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়
- নারীদের সকল ধরনের অধিকার থেকে বেশিরভাগ সময় বঞ্চিত করা হয়।

অর্থাৎ, 'জেন্ডার' শব্দটি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সমাজে নারী ও পুরুষের পৃথক ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সুযোগের পরিস্থিতি বা ধারণাকে বোঝায়। এছাড়া 'জেন্ডার' শব্দটি দ্বারা সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থানের বৈষম্য বা অসমতা প্রকাশ করা হয়।

ধাপ - ২: জেন্ডার ও সেক্স

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করুন জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যে পার্থক্য কী। তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন ও স্লাইড সহযোগে আলোচনা করুন।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিয়ের পরিণতি ও কৈশোরে গর্ভধারণের কুফল এবং কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে করণীয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন বাল্যবিয়ের পরিণতি ও কৈশোরে গর্ভধারণের কুফলগুলো কী কী। ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং নিচের সহায়ক তথ্য অনুযায়ী আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যে পার্থক্য:

অনেকেই জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারে না। কারো কারো ধারণা জেন্ডার ও সেক্স দুটো একই বিষয়, যদিও দুটো বিষয় স্পষ্টতই আলাদা।

জেন্ডার সমাজ দ্বারা সৃষ্ট আর সেক্স অর্থ একটি ছেলে-মেয়ের মধ্যকার শারীরিক/বায়োলজিক্যাল পার্থক্য। ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ এগুলো জন্মগত বা বায়োলজিক্যাল। যেমন- একজন নারী সন্তান ধারণ করতে পারে কিন্তু একজন পুরুষ সন্তান ধারণ করতে পারে না এবং এই বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয়। জেন্ডার হচ্ছে সমাজকর্তৃক নির্ধারিত নারী ও পুরুষের সামাজিক পরিচয়, তাদের মধ্যকার বৈশিষ্ট্য এবং নারী ও পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন। অতএব জেন্ডার সামাজিকভাবে নির্মিত একটি বিষয় যা পরিবর্তনশীল।

অন্যদিকে সমাজ পুরুষকে 'পুরুষ' হিসেবে এবং নারীকে 'নারী' হিসেবে ভাবমূর্তি নির্মাণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে শেখায়। সমাজের সদস্য হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও সমাজ নারী ও পুরুষের সামাজিক আচরণ/ভূমিকা নির্দিষ্ট করে। যেমন- গৃহস্থালীর কাজ ও সন্তান প্রতিপালন কাজের দায়িত্ব কেবল নারীর এবং সমাজ দ্বারা আরোপিত এই ভূমিকা পরিবর্তনীয়। সেক্স বা লিঙ্গ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী পুরুষের স্বাতন্ত্র্য, কিংবা নারী পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য যা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে পার্থক্য

জেন্ডার	সেক্স
পরিবর্তনশীল	অপরিবর্তনীয়
সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন	পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম
অনির্ধারিত	নির্ধারিত
সমাজ কর্তৃক আরোপিত	আবহমান কাল ধরে একই
মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট	প্রকৃতি প্রদত্ত
রীতিনীতি অর্জিত/অর্পিত হয়	জন্মগত
সমাজসৃষ্ট ভূমিকা, দায়িত্ব, আচরণ	শারীরিক

ধাপ - ৩: জেন্ডার ভূমিকা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন, জেন্ডার ভূমিকা সম্পর্কে তাদের ধারণা কী। তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং স্লাইড সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার ভূমিকা বলতে কি বুঝায়:

পরিবার ও সমাজে ব্যক্তি হিসেবে নারী ও পুরুষ কিছু ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রতিটি সমাজের নারী ও পুরুষ সামাজিকভাবে নির্ধারিত কাজের দ্বারা যে ভূমিকা পালন করে তাকে জেন্ডার ভূমিকা বলে। জেন্ডার ভূমিকা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

নারীরা সমাজে মূলত তিন ধরনের ভূমিকা পালন করে-

১. প্রজনন ভূমিকা: সন্তান জন্ম দেয়া, লালন-পালন করা এবং এ সংক্রান্ত কাজকর্মে যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকে প্রজনন ভূমিকা বলে

২. উৎপাদনমূলক ভূমিকা: যেসব কাজের মাধ্যমে আয় (অর্থনৈতিক) উপার্জন করা হয় সেসব কাজের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখা হয় তাকে বলা হয় উৎপাদনমূলক ভূমিকা। বেশিরভাগ সময়ে পুরুষরাই এই কাজ করে থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু নারীরা গৃহস্থালী নানা কাজের পাশাপাশি উৎপাদনমূলক ভূমিকাও পালন করে থাকে। যেমন- গ্রামের মহিলারা ক্ষেতে কাজ করে; বাড়িতে শাক-সবজি ফলায়, হাঁস-মুরগি পালন করে, গরু-ছাগলের লালন পালনে যথেষ্ট সময় নিয়োজিত থাকে

৩. সামাজিক ভূমিকা: যেসব কাজ কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হলো সামাজিক ভূমিকা। নারীরাও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান/কাজকর্ম, যেমন- বিবাহ, জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, রাস্তা মেরামত এসব ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

নারীদের প্রজনন ভূমিকা অনস্বীকার্য তবে উৎপাদনমূলক ভূমিকায় তাদের বিবেচনা করা হয় না। কারণ সমাজে যেহেতু এসব কাজের কোন সুনির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য ধরা হয় না কিংবা এগুলোকে আলাদাভাবে কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না; তাই নারীদের এই কাজগুলোকে সমাজ সাধারণত উৎপাদনশীল কাজ হিসাবে গণ্য করে না। তবে বর্তমান সমাজে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি উৎপাদনমূলক কাজের সাথে বেশী করে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

আবার বিভিন্ন সামাজিক কাজ, যেমন- নির্বাচনে অংশ নেয়া, এলাকার স্কুল বা নলকূপ কোথায় বসবে তা নির্ধারণ করা ইত্যাদি কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত এবং এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকাই বেশী বলে বিবেচনা করা হয়।

ধাপ - ৪: জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার বৈষম্য বলতে কি বোঝায়- এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন। ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার বৈষম্য:

আমরা সাধারণত নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকি ও সেইভাবে আচরণ করি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সৃষ্টি হয় জেন্ডার বৈষম্যের।

দীর্ঘদিনের চিরাচারিত মনোভাবের কারণে আমাদের অনেক আচরণ যে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে তা আমরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতেই পারি না, আর সেজন্য বুঝতে পারি না যে জেন্ডার বৈষম্য কি।

অথচ, বৈষম্যভিত্তিক এই আচরণ ছড়িয়ে রয়েছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে। আর এর টিকে থাকার পিছনে ভূমিকা রাখছে সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো ও বিভিন্ন প্রথা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি। এই জেন্ডার বৈষম্য একদিকে যেমন নারীর সমঅধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে, অন্যদিকে তেমনি মারাত্মকভাবে নারীর স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করছে।

নারী ও পুরুষের এই জেন্ডার বৈষম্য

- সামাজিকভাবে তৈরি
- পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে গৃহীত
- সমাজ ও স্থান ভেদে ভিন্ন
- অবশ্যই পরিবর্তনশীল।

সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য -

- সমাজে সকল ক্ষেত্র, যেমন- শিক্ষা, খাদ্য, পারিশ্রমিক, স্বাস্থ্যসেবা-এসব পাওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার
- পরিবারে কন্যা সন্তান থেকে পুত্র সন্তানের অধিক মূল্যায়ন
- পরিবারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্য অধিক ও পুষ্টিকর খাদ্যের বরাদ্দ
- মেয়েদের পড়াশোনার জন্য খরচ করতে বাবা-মায়ের অনীহা কেননা বিয়ের পরে মেয়েরা অন্যের বাড়ি চলে যায়
- মেয়ে সন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করা এবং মেয়েদের বাল্যবিয়ে দেয়া।

- বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে পাত্রপক্ষের যৌতুক দাবী করা এবং যৌতুক আদায়ের জন্য স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন
- নারীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা
- মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের গুরুত্বের বিষয়ে পরিবারের অসচেতনতা ও অনীহা
- বাল্যবিয়ের কারণে কিশোরী বয়সেই গর্ভধারণ
- নারীর প্রজনন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কম থাকায় পরিবার ছোট রাখার বা নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়ে মতামত প্রদান করতে না পারা
- নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে মেনে নেয়ার প্রবণতা
- সমাজ ও পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম থাকা
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের দক্ষতা প্রমাণে সমান সুযোগ না দেয়া
- পুরুষদের তুলনায় নারী কর্মীদের কম পারিশ্রামিক দেয়ার প্রবণতা
- নিজ উপার্জনের উপর নারীদের অধিকার না থাকা
- নারী-পুরুষের মাঝে সম্পদ বন্টনে অসম বিভাজন
- নারীর উপর আরোপিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা যা নারীর জন্য অবমূল্যায়নকর ও ক্ষতিকারক ইত্যাদি।

জেন্ডারের এই অসম সম্পর্ক/অবস্থান যখন আইন, নীতি বা মূল্যবোধের মাধ্যমে বৈধ করা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়, অপরিবর্তনীয় প্রথা হিসেবে চালু করা হয়, তখন সেটি বৈষম্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণ:

- সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী
- ধর্মের অপব্যাখ্যা
- মেয়েদের ছোট করে দেখার মানসিকতা জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি করে।

বৈষম্য সরাসরি কাজ করে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ওপর যা নারীর জন্য স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব-	
• অসম স্বাস্থ্য সুবিধা	• পুষ্টিহীনতা
• রক্তস্বল্পতা	• অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ
• গর্ভধারণ বিষয়ক জটিলতা থেকে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা	• অধিক মাতৃমৃত্যু হার
• প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন জটিলতা ও যৌন বাহিত রোগ	• মানসিক অসুস্থতা
• অকাল বার্ধক্য	

ধাপ - ৫: জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপায়

ছাত্র-ছাত্রীদের বলুন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে কী ধরণের সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে এবং কি করণীয়। এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের পর নিচের সহায়ক তথ্য এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ:

এখন ভেবে দেখার সময় দীর্ঘদিনের সংস্কার, অসচেতনতা ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়ে আমরা নারী ও পুরুষকে প্রচলিত বা গতানুগতিক যে ভূমিকাগুলোতে দেখে থাকি এবং সে অনুযায়ী যে আচরণ করি সেগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত আর কতটা বৈষম্যমূলক। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনের।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে যে বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন তা হলো:

- জেন্ডার বৈষম্য রোধে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- সম মর্যাদা, স্বাধীনতা নিয়ে নারী-পুরুষ বেড়ে উঠবে, যার পরিচয় হবে শুধু মানুষ হিসেবে
- নারী পুরুষ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন না করে মানুষ হিসেবে একই রকম ভূমিকা পালন করবে
- নারী শিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ, নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীর অন্য সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করা
- পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও চাকুরী, ব্যবসাসহ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি দক্ষ নারীশক্তি গড়ে তোলা
- দক্ষতা অনুসারে সকল কর্মকাণ্ডে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারীর অধিকার রক্ষায় সকল প্রকার আইনী সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা
- নারীর অধিকার রক্ষায় ধর্মীয় বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা
- সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন করা
- পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া
- নারীকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য দেশের প্রচলিত আইনের প্রয়োগ করা
- যে সব প্রথা বা রীতিনীতি জেন্ডার বৈষম্য টিকিয়ে রাখছে তা চিহ্নিত করে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করা
- নারীকে নিজের এবং নারীদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে সচেতন হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

নারী ও পুরুষের প্রচলিত বা গতানুগতিক ভূমিকাগুলো দূর করে সমতা এবং ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

সমতা: সমতা বলতে সাধারণত সমঅবস্থাকে বুঝায়। সমতা হচ্ছে সমভাবে বন্টন অর্থাৎ প্রাপ্তি, দায়িত্ব পালন, সুযোগ-সুবিধা লাভ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা। যেমন: চাকুরীর বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হলে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ অথবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সকলই আবেদন করার সুযোগ পাবে।

ন্যায্যতা: প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন অর্থাৎ প্রাপ্তি, দায়িত্ব পালন, সুযোগ-সুবিধা লাভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ন্যায্যতা।

জেন্ডার সমতা

- জেন্ডার সমতা হচ্ছে দৃশ্যমান সমতা। ব্যক্তিগত পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে এবং জনসম্মুখে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন নির্দেশ করে
- জেন্ডার সমতা নারী এবং পুরুষ এক তা মনে করে না, নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব, সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার সমান হবে
- দায়িত্ব, সুযোগ সুবিধা, আচরণ, মূল্যায়ন নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়ার উপর নির্ভর করে না।
- পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেয়া।

সাম্য ও সমতার পার্থক্য

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীরা এখনো পিছিয়ে রয়েছে। তাই পুরুষের চেয়ে নারীকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাম্যের (Equity) মাধ্যমে জেন্ডার সমতা (Equality) আনতে হবে।

ধাপ - ৬: সারসংক্ষেপ

উপস্থাপক এই অধিবেশন শেষ করবেন এইভাবে যে, একজন কিশোর অথবা কিশোরী হিসাবে নিজে জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং এ বিষয়ে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সচেতন করে তোলার ব্যাপারে তোমাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তোমরাই পারবে সমাজে পরিবর্তন আনতে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন:

১) জেন্ডার কী? নারী-পুরুষ সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলো বল?
২) জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে পার্থক্য কি? জেন্ডার ভূমিকা বলতে কি বুঝায়?
৩) জেন্ডার বৈষম্য বলতে কি বোঝ? সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্যগুলো কি কি?
৪) জেন্ডার বৈষম্যের কারণ কি? জেন্ডার বৈষম্যের কারণে কি ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে?
৫) কিভাবে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা যেতে পারে?

অধ্যায় - ১১: মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, যৌন নিপীড়ন এর কারণ ও প্রতিকার

সময়: ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা ইভটিজিং বা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা সম্পর্কে এবং ইভটিজিং সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে নিজেদের কি করা উচিত ও এর প্রতিকারমূলক উপায় সম্পর্কে জানতে পারবে। এছাড়া কীভাবে ইভটিজিং থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করবে এবং এ ধরণের দূর্ঘটনার মুখোমুখি হলে কি করা উচিত সে সর্ম্পকে নিজেরা জানতে পারবে ও সহপাঠীদের জানাবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	ইভটিজিং (মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা) ও যৌন হয়রানি কী?	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
২	ইভটিজিং কেন হয় এবং কারা করে	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর আলোচনা	ব্ল্যাকবোর্ড
৩	কারা ইভটিজিং-এর শিকার হয়? ইভটিজিং বন্ধে কারা ভূমিকা রাখতে পারে	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর আলোচনা	ব্ল্যাকবোর্ড
৪	ইভটিজিং প্রতিরোধ এবং এর শিকার হলে কি করা প্রয়োজন?	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া
৫.	কীভাবে ইভটিজিং/যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করবে?	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৬.	ইভটিজিং/যৌন নিপীড়ন মুখোমুখি হলে কি করা উচিত?	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৭.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	-	-

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষকের জন্য সহায়ক তথ্য:

ধাপ - ১: ইভটিজিং (মেয়েদের উত্যক্ত করা) ও যৌন হয়রানি কী?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন, মেয়েদের উত্যক্ত করা (ইভটিজিং) এবং যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন সম্পর্কে তারা কী জানে। এ সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং সহায়ক তথ্যের সাহায্যে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

ইভ (EVE) শব্দটি পবিত্র বাইবেল-এর 'ইভ' থেকে এসেছে, যার অর্থ পৃথিবীর আদি মাতা। ইসলাম ধর্মে যাঁকে বলা হয় বিবি হাওয়া, হিব্রুতে বলে 'হাব্বাহ'। শব্দটি নারী জাতির রূপক বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টিজিং (TEASING) শব্দের আভিধানিক অর্থ ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা, প্রশ্ন করে বিব্রত করা, উত্ত্যক্ত বা জ্বালাতন করা। ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির একটি অমার্জিত ভাষা, যা সৃষ্টি বিবরণে পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত প্রথম নারী "হাওয়া" ও "ইভ"কে নির্দেশ করে।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে একটি সামাজিক সমস্যা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সমস্যাটি হলো-সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট বা যৌন হয়রানি। এটি একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। এর শিকার হয়ে দেশব্যাপী আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের কিছু দৈহিক পরিবর্তন ঘটে যা তাদেরকে পুরুষদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। তোমরা হয়তো জানো যে, ছেলেরা, এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে থাকে। উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং এক ধরনের যৌন নিপীড়ন। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী উত্ত্যক্ত করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অনেক সময় কিশোর-কিশোরী বিশেষ করে কিশোরীদেরকে রাস্তাঘাটে, বাসে বা অন্যান্য স্থানে ছেলেদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অশোভন ও অস্বস্তিকর আচরণ, কথাবার্তা, মন্তব্য কিংবা শারীরিক স্পর্শের সম্মুখীন হতে হয়। একে ইভটিজিং/যৌন নিপীড়ন বা যৌন হয়রানি বলে। ইভটিজিং/যৌন নিপীড়ন বা যৌন হয়রানি অনেকভাবেই হতে পারে। আজকাল তথ্য প্রযুক্তি যেমন- মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউব ইত্যাদির অপব্যবহারের মাধ্যমে অনেকে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়।

ইভ টিজিং বা যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়

- অনাকাংক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা
- প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা
- যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি
- যৌন সুযোগলাভের জন্য অবৈধ আবেদন
- পর্ণোগ্রাফি দেখানো
- যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি
- অশালীন ভঙ্গি, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা বা পেছন পেছন যাওয়া, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা